بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ জানুয়ারি ২০২১ মোতাবেক ২৯ সুলাহ্, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উসমান (রা.)-এর বিভিন্ন যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে উল্লেখ করছি। যেমনটি বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসমান (রা.) বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারেন নি কেননা, তার সহধর্মিণী রসূল তনয়া হযরত রুকাইয়্যা (রা.) গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, তাই মহানবী (সা.) তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাকে (রা.) মদীনায় অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে (রা.) বদরের (যুদ্ধে) অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা দিয়েছেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) তার জন্য বদরের (যুদ্ধে) অংশগ্রহণকারীদের মতই যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ও পুরস্কারে অংশ নির্ধারণ করেছেন। **(শরাহ্ আল্লামা যারকানী আলাল্ মওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৪, বাবু গযওয়াতি বদরুল্ কুবরা, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

তৃতীয় হিজরীর মহররম বা সফর (মাসে) গাতফানের যুদ্ধ হয়। গাতফানের যুদ্ধের জন্য নজদ অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন আর এ কারণে তিনি এতেও যোগদান করেন নি। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১, উসমান বিন আফ্ফান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃ: ৪৬৩}**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ এভাবে দিয়েছেন,

"বনু গাতফানের কোন কোন গোত্র অর্থাৎ বনু সা'লাবাহ্ এবং বনু মোহারেব এর সদস্যরা তাদের একজন নামকরা যোদ্ধা দ'সূর বিন হারেস এর আহ্বানে মদীনার ওপর অতর্কিতে আক্রমন করার দুরভিসন্ধি নিয়ে নজদ এর একটি স্থান **'যী আমর'** এ সমবেত হতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) যেহেতু তাঁর শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে নিয়মিত খবরাখবর রাখতেন (তাই) তিনি (সা.) সময়মত তাদের এই হিংস্র অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হন আর তিনি একজন বিচক্ষণ সেনানায়কের মতো আগাম ব্যবস্থা হিসেবে সাড়ে চারশ' সাহাবীর একটি দলকে নিজের সাথে নিয়ে ৩য় হিজরীর মহররমের শেষ দিকে অথবা সফর (মাসের) প্রারম্ভে মদীনা হতে যাত্রা করেন এবং দ্রুত গতিতে সফর করে **'যী আমর'** এর কাছাকাছি পৌঁছে যান। শত্রুরা তাঁর আগমন সংবাদ পেতেই ত্বরিৎ পার্শ্ববর্তী টিলায় উঠে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেয় আর মুসলমানরা **'যী আমর'**এ পৌঁছার পর দেখে ময়দান (একেবারে) ফাঁকা। তবে, বনু সা'লাবাহ্'র জব্বার নামের একজন বেদুঈন সাহাবীদের হাতে ধরা পড়ে, (তারা) তাকে বন্দী করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তার কাছে খবরাখবর জিজ্ঞেস করলে জানা যায় বনু সা'লাবাহ্ এবং বনু মোহারেব এর সকল সদস্য পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে মুসলমানদের সামনে আসবে না। অগত্যা মহানবী (সা.)-কে (নিজ বাহিনীকে) ফিরে আসার নির্দেশ দিতে হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের এতটুকু লাভ অবশ্যই হয়েছে, অর্থাৎ সে সময় গাতফান গোত্রের পক্ষ থেকে যে আশংকা দেখা দিয়েছিল- তা সাময়িকভাবে টলে যায়।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃ: ৪৬৩}**

উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে। হযরত উসমান (রা.) উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। প্রথম দু'টি যুদ্ধে তিনি (যোগদান) করেন নি কিন্তু উহুদের যুদ্ধে তিনি যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে সাহাবীদের একটি দল এমন ছিল যারা অতর্কিত আক্রমন এবং মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে রণক্ষেত্র থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন আর এমনও একটি সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে মাত্র ১২জন সাহাবীর ছোট্ট একটি দল রয়ে গিয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **(শরাহ্ আল্লামা যারকানী আলাল্ মওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৮-৪১৯, বাবু গযওয়াতি বদরুল্ কুবরা, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

মুসলমানরা যখন কুরাইশ বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করে আর তারা গণিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জড়ো করতে আরম্ভ করে তখন মহানবী (সা.) যেই পঞ্চাশজন তিরন্দাজকে নিজ স্থান পরিত্যাগ করতে বারণ করেছিলেন তারা বিজয় দেখে নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে, অথচ মহানবী (সা.) তাদেরকে নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করতে কঠোরভাবে বারণ করেছিলেন। খালেদ বিন ওয়ালীদ, যিনি তখনও মুসলমান হন নি, তিনি এই দৃশ্য দেখে ত্বরিৎ সেদিক দিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ এত অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত এবং এমন প্রচণ্ড ছিল যে, মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ছত্রভঙ্গ সাহাবীদের মাঝে হযরত উসমান (রা.)'র নামও উল্লেখ করা হয়।

পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, তখনকার বিশেষ পরিস্থিতি এবং তাদের আন্তরিক ঈমান ও নিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

(সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৬)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, যেদিন দু'দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিল, নিশ্চয় তাদের কোন কোন কৃতকর্মের দরুন শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করতে চেষ্টা করেছিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মার্জনা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল এবং পরম সহিষ্ণু।"

এই যুদ্ধকালে মুসলমানদের উক্ত অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেন,

"কুরাইশ বাহিনী প্রায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল আর নিজেদের উপর্যুপরি আক্রমণে প্রতি মুহূর্তে চাপ বৃদ্ধি করছিল। এটিও মুসলমানরা হয়ত কিছু সময় পর সামলে উঠতে পারত, কিন্তু সর্বনাশ যা হয়েছে তা হল, কুরাইশদের এক সাহসী সৈনিক আব্দুল্লাহ্ বিন কামিয়াহ্ মুসলমানদের পতাকাবাহক মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র ওপর আক্রমণ করে এবং নিজ তরবারির আঘাতে তাঁর ডান হাত কেটে ফেলে। মুসআব (রা.) তৎক্ষণাৎ অপর হাতে পতাকা তুলে নেন আর ইবনে কামিয়াহ্কে মোকাবিলার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু সে দ্বিতীয় আঘাতে তার অপর হাতও ছিন্ন করে দেয়। তখন মুসআব (রা.) নিজের উভয় কর্তিত হাত একত্রিত করে পতনোন্মুখ ইসলামী পতাকাকে সামলানোর চেষ্টা করেন এবং সেটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। এ সময় ইবনে কামিয়াহ্ তাঁর ওপর তৃতীয় আঘাত হানে আর এবার মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যান। যদিও অন্য একজন মুসলমান তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রসর হয়ে পতাকা হাতে তুলে নেন, কিন্তু যেহেতু মুসআব (রা.)'র গঠন-গড়ন মহানবী (সা.)-এর সাথে

সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, তাই ইবনে কামিয়াহ্ ধরে নেয় যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। অথবা হতে পারে এটি তার পক্ষ থেকে দুষ্কৃতি ও প্রতারণামূলকভাবে হয়ে থাকবে। যাহোক, মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যাওয়ায় সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। এই সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট সম্বিতটুকুও লোপ পেতে থাকে এবং তাদের ঐক্য পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়। আর অনেক সাহাবী হতভম্ব হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করে। তখন মুসলমানরা তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক দল ছিল তাদের, যারা মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিল আর এই দলের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম।" অথবা বলা যায়, তারা নিরাশ হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। "তাদের মাঝে হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে, তখনকার বিশেষ পরিস্থিতি এবং তাদের আন্তরিক ঈমান ও নিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের মাঝ থেকে কেউ কেউ মদীনায় পৌঁছে যায়। আর এভাবে মদীনায়ও মহানবী (সা.)-এর কাল্পনিক শাহাদত এবং ইসলামী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে যায়, যার ফলে পুরো শহরে মাতম শুরু হয়ে যায় আর মুসলমান আবালবৃদ্ধবণিতা (সবাই) অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং উহুদ (প্রান্তরের) অভিমুখে যাত্রা করে। আর কেউ কেউ হতভম্ব হয়ে ছুটতে ছুটতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দলে ছিল তারা, যারা যুদ্ধক্ষেত্র না ছাড়লেও, মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে হয় হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল অথবা এখন যুদ্ধ করাকে নিরর্থক মনে করেছিল। তাই তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে একপাশে মাথা নিচু করে বসে পড়েন। তৃতীয় দল ছিল তাদের, যারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মাঝে কতিপয় এমনও ছিল- যারা মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত ছিল এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল; আর অধিকাংশ ছিল এমন যারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করছিল। তারা এবং একইসাথে দ্বিতীয় দলের লোকেরাও যতই মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার সংবাদ পাচ্ছিল ততই উন্মাদের ন্যায় লড়তে লড়তে তাঁর (সা.) চতুর্দিকে জড়ো হচ্ছিল। সে সময় যুদ্ধের অবস্থা এমন ছিল যে, কুরাইশদের সেনাবাহিনী সমুদ্রের ভয়াল ঢেউয়ের ন্যায় চতুর্দিক থেকে আছড়ে পড়ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সকল দিক থেকে তির এবং পাথর বর্ষিত হচ্ছিল। এরূপ বিপদসংকুল অবস্থা দেখে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে তাঁর পবিত্র দেহের চারপাশে মানবঢাল তৈরি করে। তথাপি যখনই আক্রমণের ঢেউ আসত তখন এই গুটিকতক লোককে ধাক্কা দিয়ে এদিক সেদিক সরিয়ে ফেলতো আর এরূপ অবস্থায় কয়েকবার এমন হয়েছে যে, মহানবী (সা.) প্রায় একা থেকে যেতেন।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃঃ ৪৯৩-৪৯৪}**

যাহোক বলা হয়, তখন হযরত উসমান (রা.) হতাশ হয়ে অথবা অন্য কোন কারণে মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হতাশ হয়ে বসে পড়া লোকদের মাঝে হযরত উমর (রা.)ও উল্লেখ পাওয়া যায়; যাহোক সেটা যথাসময়ে বর্ণনা করা হবে।

এবার আমি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং বয়আতে রিযওয়ান হয়েছিল, তাতে হযরত উসমান (রা.)'র ভূমিকা বা তাঁর সম্পর্কে কী কী তথ্য পাওয়া যায়, তা উল্লেখ

করছি। মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে এবং চুল ছেঁটে বায়তুল্লাহ্‌তে প্রবেশ করছেন। এই স্বপ্নের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) ষষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসে তাঁর চৌদ্দশ' সাহাবীকে সাথে নিয়ে উমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি দেন। কুরাইশরা মহানবী (সা.)-কে উমরাহ্ করতে বাধা প্রদান করে। দু'পক্ষের মাঝে যখন কূটনৈতিক আলোচনার সূচনা হয় এবং মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের উত্তেজনা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি (সা.) বলেন এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করা হোক যিনি মক্কার অধিবাসী হবেন এবং কুরাইশদের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হবেন। **(শরাহ্ আল্লামা যারকানী আলাল্ মওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়াহ্ লিলকাসতালানী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯-১৭০, ৬৬৬, আমরুল হুদাইবয়াহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

কাজেই তখন হযরত উসমান (রা.)-কে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তার কিছুটা আমি এখানে বর্ণনা করছি। তিনি (রা.) লিখেন,

মহানবী (সা.) একটি স্বপ্ন দেখেন, তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র (কা'বা গৃহের) তওয়াফ করছেন। তখন যিলক্বদ মাস সন্নিকটে ছিল, যাকে অজ্ঞতার যুগেও সেই চারটি পবিত্র মাসের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা হতো যেগুলোতে সর্বপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ একদিকে তিনি এই স্বপ্ন দেখেন আর অপর দিকে সময়ও এমন ছিল যে, আরবের চতুর্সীমায় যুদ্ধ-বিগ্রহ থেমে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসত। যদিও তখন হজ্জের মৌসুম ছিল না এবং তখনও পর্যন্ত ইসলামে হজ্জব্রত পালন যথারীতি নির্ধারিত হয় নি, কিন্তু কা'বা শরীফের তওয়াফ সবসময়ই করা যেত, তাই তিনি (সা.) এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর সাহাবীদেরকে উমরার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানান। সে সময় তিনি (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাও প্রদান করেন যে, যেহেতু এ যাত্রায় কোন ধরনের যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নেই বরং কেবল এক শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় ইবাদত পালন করাই উদ্দেশ্য, তাই এই সফরে মুসলমানদের কোন ধরনের অস্ত্র সাথে নেয়া উচিত হবে না। তবে হ্যাঁ, আরবদের রীতি অনুযায়ী কেবল নিজেদের তরবারি খাপে আবদ্ধ করে ভ্রমনকারীদের মত নিজেদের সাথে রাখা যেতে পারে। পাশাপাশি তিনি (সা.) মদীনার চতুর্দিকে বসবাসরত বেদুঈন লোকদেরও তাঁর সাথে গিয়ে উমরাহ করার আহবান জানান- যারা বাহ্যত মুসলমানদের সাথে ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, খুবই অল্পসংখ্যক বা নামে মাত্র কিছু লোক ব্যতীত ঐসব দুর্বল ইমানের অধিকারী তথাকথিত মুসলমান বেদুঈনগণ, যারা মদীনার আশপাশে বসবাস করতো, মহানবী (সা.)-এর সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানায় কেননা তাদের ধারণা ছিল, যদিও মুসলমানরা উমরার নিয়্যত বৈ অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাচ্ছে না, কিন্তু কুরাইশরা অবশ্যই মুসলমানদেরকে বাধা প্রদান করবে আর এভাবে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আর তারা মনে করতো, যেহেতু এই মোকাবিলা মক্কার অদূরে এবং মদীনা থেকে দূরে হবে, তাই কোন মুসলমান জীবিত ফিরে আসতে পারবে না– এই ভয়ে তারা উক্ত কাফেলায় যোগ দেয় নি। যাহোক, মহানবী (সা.) প্রায় চৌদ্দ শতাধিক সাহাবীর একটি দল নিয়ে ষষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ (মাসের) প্রারম্ভে সোমবার প্রভাতে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। এই সফরে তাঁর সহধর্মিণী মোহতরমা হযরত উম্মে সালমাহ্ (রা.) তাঁর সহযাত্রী ছিলেন আর মদীনার আমীর হিসেবে নুমায়লাহ্ বিন

আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে এবং ইমামুস সালাত হিসেবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আব্দুল্লাহ্ বিন মাকতুম (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

তিনি (সা.) মদীনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরত্বে মক্কার পথে অবস্থিত যুল হুলায়ফা'য় গিয়ে পৌঁছার পর যাত্রা বিরতির আদেশ দেন এবং যোহর নামায পড়ে কুরবানীর উটগুলোকে চিহ্নিত করার নির্দেশ প্রদান করেন, যা সংখ্যায় ছিল ৭০টি এবং সাহাবীদেরকে হাজীদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ পোষাক পরিধানের নির্দেশ দেন যাকে পরিভাষাগতভাবে এহরাম বলা হয় এবং তিনি নিজেও এহরাম বাঁধেন। অতঃপর কুরাইশদের অবস্থা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে যে, তাদের কোন দূরভিসন্ধি নেই তো? খুযা'আহ্ গোত্রের এক সদস্য বুসর বিন সুফিয়ানকে যিনি মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস করতেন বার্তাবাহকরূপে অগ্রে প্রেরণ করে ধীরে ধীরে মক্কা অভিমুখে এগোতে থাকেন। আর অতিরিক্ত সাবধানতা হিসেবে মুসলমানদের বড় দলের অগ্রভাগে থাকার জন্য আব্বাদ বিন বিশর (রা.)'র নেতৃত্বে বিশজন অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্রদলও নিযুক্ত করেন। তিনি (সা.) যখন কয়েকদিনের পথ পাড়ি দিয়ে **আসফানের** নিকটে পৌঁছেন, যা মক্কা থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল দূরত্বে পৌঁছেন, (বলা হয়, এক মঞ্জিল হচ্ছে নয় মাইলের সমান)। তখন বার্তাবাহক ফেরত এসে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন, মক্কার কুরাইশরা খুবই উত্তেজিত এবং আপনাকে বাধা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমনকি তাদের মাঝে কেউ কেউ নিজেদের উত্তেজনা এবং হিংস্রতা প্রকাশার্থে চিতার চামড়া পরিধান করে রেখেছে এবং যুদ্ধের দৃঢ় সংকল্প করে মুসলমানদেরকে যে কোন মূল্যে বাধা প্রদান করার প্রতিজ্ঞা করেছে। এটিও জানা গেছে, কুরাইশরা নিজেদের কতিপয় আত্মত্যাগী অশ্বারোহীর এক ক্ষুদ্রদল খালেদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে সম্মুখে প্রেরণ করেছে যিনি তখনও মুসলমান হন নি; আর সম্ভবত সেই দলটি মুসলমানদের কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে, এছাড়া সেই দলে ইকরামা বিন আবু জেহেলও আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মহানবী (সা.) এই খবর শুনে সংঘাত এড়াতে সাহাবীদেরকে এই আদেশ দেন যে, তারা মক্কার পরিচিত পথে না গিয়ে ডান দিকে গিয়ে যেন সম্মুখে অগ্রসর হয়। অতএব মুসলমানরা একটি কঠিন ও দুর্গম পথে সমুদ্রকূল ঘেঁষে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। মহানবী (সা.) যখন সেই নতুন পথ পাড়ি দিয়ে হুদায়বিয়ার নিকটে উপনীত হন, যা মক্কা থেকে এক মঞ্জিল অর্থাৎ কেবল নয় মাইল দুরত্বে অবস্থিত আর হুদায়বিয়ার ঘাঁটি থেকেই মক্কার উপত্যকার সূচনা হয়ে যায়; তখন হঠাৎ করে তাঁর 'কুসওয়া' নামে পরিচিত উঁটনী পা ছড়িয়ে হাঁটু গেঁড়ে মাটিতে বসে পড়ে- যা তিনি (সা.) অনেক যুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। শত চেষ্টা করেও তাকে দাঁড় করানো যাচ্ছিল না। সাহাবীগণ নিবেদন করেন, সম্ভবত সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, না না, সে ক্লান্ত হয়নি। আর এভাবে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়া এর অভ্যাসও না। বরং আসল বিষয় হল, এর পূর্বে যেই মহান সত্তা আসহাবে ফীল বা হস্তি বাহিনীর হাতিকে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিলেন, তিনিই এখন এই উঁটনীকেও থামিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্‌র কসম! মক্কার কুরাইশরা বায়তুল হারামের সম্মানার্থে যে দাবীই আমার কাছে উত্থাপন করবে, আমি তা মেনে নিব। এরপর তিনি তাঁর উঁটনীকে পুনরায় দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলে আল্লাহ্‌র কি মহিমা! এবার সে ত্বরিৎ উঠে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারপর তিনি (সা.) সেটিকে হুদায়বিয়া উপত্যকার অপরপ্রান্তে নিয়ে যান। সেখানে একটি ঝরনার নিকটে থেমে উঁটনী থেকে নিচে নামেন এবং সেখানেই তাঁর নির্দেশে সাহাবীরা (রা.) শিবির স্থাপন করেন।

এরপর উল্লেখ রয়েছে, কুরাইশদের সাথে সন্ধির আলোচনার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে। মহানবী (সা.) হুদায়বিয়া উপত্যকায় পৌঁছে উপত্যকার ঝর্ণার পাশে শিবির স্থাপন করেন। যখন সাহাবীগণ (রা.) সেখানে শিবির স্থাপন করেন তখন খুযা'আহ্ গোত্রের বুদাইল বিন ওয়ারকা নামের একজন প্রসিদ্ধ নেতা যে নিকটস্থ এলাকাতেই বাস করতো, কয়েকজন সঙ্গীসহ মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। সে তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করে, মক্কার নেতারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তারা আপনাকে কখনোই মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। তিনি (সা.) বলেন, আমরা তো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসি নি বরং কেবল উমরা করার অভিপ্রায়ে এসেছি। পরিতাপ! যুদ্ধের আগুন মক্কার কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলেছে, তবুও এরা নিবৃত্ত হয় না; আমি তো তাদের সাথে এই সমঝোতার জন্যও প্রস্তুত যে– তারা যেন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে আর আমাকে অন্যদের বিষয়ে বাধা না দেয়। মক্কবাসীদের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। তাদের সাথে আমি কোন সম্পর্ক রাখব না আর অন্যদের মাঝে ইসলামের বার্তা পৌঁছাব। কিন্তু যদি তারা আমার এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে এবং যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখে তবে আমিও সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিব না যতক্ষণ না এ পথে আমার প্রাণ বিসর্জিত হয় অথবা খোদা আমাকে বিজয় দান করেন। আমি যদি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই তাহলে তো ঝামেলাই শেষ। কিন্তু যদি খোদা তা'লা আমাকে জয়যুক্ত করেন এবং আমার আনীত ধর্ম বিজয় লাভ করে তাহলে মক্কাবাসীদেরও ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন ধরণের দ্বিধাদ্বন্দ থাকা উচিত হবে না। বুদায়েল বিন ওয়ারকার ওপর মহানবী (সা.)-এর এই আন্তরিক এবং বেদনাভরা বক্তব্যের গভীর প্রভাব পড়ে এবং সে তাঁর (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে, আপনি আমাকে সামান্য অবকাশ দিন আমি যেন মক্কায় গিয়ে আপনার এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারি এবং সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করতে পারি। তিনি (সা.) অনুমতি দেন। বুদায়েল তার গোত্রের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওনা হয়।

বুদায়েল বিন ওয়ারকা মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদের সমবেত করে তাদেরকে বলে, আমি সেই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে আসছি। তিনি আমার কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। আপনাদের অনুমতি পেলে আমি তা উল্লেখ করি। জবাবে কুরাইশদের উত্তেজিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা বলতে আরম্ভ করে, আমরা ঐ ব্যক্তির কোন কথা কানে তুলতে চাই না। কিন্তু বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল লোকেরা বললো, 'ঠিক আছে তার যে প্রস্তাবই আছে তা আমাদের বলো। অতএব, বুদায়েল হুযূর (সা.)-এর প্রস্তাব পুনরাবৃত্তি করে। উরওয়াহ্ বিন মাসঊদ নামের সাকীফ গোত্রের এক প্রভাবশালী নেতা তখন মক্কায় ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে আরবদের প্রাচীন রীতি অনুসারে কুরাইশদের বলেন, হে লোকেরা আমি কি তোমাদের পিতার মত নই? তারা বললো, হ্যাঁ। এরপর তিনি বলেন, তোমরা কি আমার সন্তানতুল্য নও? তারা বললো, হ্যাঁ। পুনরায় উরওয়াহ্ বলেন, তোমরা কি আমাকে কোনভাবে অবিশ্বাস করতে পার? কুরাইশরা বললো, কখনোই না। তখন সে বলে, তাহলে আমি মনে করি এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের সামনে একটি উত্তম প্রস্তাব রেখেছেন। তাঁর প্রস্তাব তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। আর আমাকে অনুমতি দাও যেন আমি তোমাদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে আরো আলোচনা করতে পারি। কুরাইশরা বললো, ঠিক আছে আপনি আমাদের পক্ষ থেকে গিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করুন।

সে যখন মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন সেখানে সে এক প্রাণোদ্দীপক দৃশ্যও দেখে। উরওয়াহ্ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁর (সা.) সাথে আলোচনা আরম্ভ করে। তিনি (সা.) তার সামনে সেই বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করেন– যা এর আগে বুদায়েল বিন ওয়ারকার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। উরওয়াহ্ নীতিগতভাবে মহানবী (সা.)-এর অভিমতের সাথে একমত ছিল। কিন্তু কুরাইশের পক্ষে দূতের দায়িত্ব পালন এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় যত বেশি সম্ভব শর্ত মানানোর চেষ্টায় ছিল। উরওয়াহ্ মহানবী (সা.)-এর সাথে আলোচনা শেষ করে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়েই বলে, হে লোকেরা! আমি জীবনে অনেক সফর করেছি। বিভিন্ন রাজ দরবারে উপস্থিত ছিলাম। কায়সার, কিসরা, নাজ্জাশীর দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলেছি। কিন্তু খোদার কসম! যেভাবে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীদের তাঁকে সম্মান করতে দেখেছি এমনটি আর কোথাও দেখিনি। এরপর মহানবী (সা.)-এর সভায় দেখা তার পুরো অভিজ্ঞতা সে বর্ণনা করে। পরিশেষে বলে, আমি তোমাদের এই পরামর্শ দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রস্তাব একটি ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব, তাই এটি গ্রহণ করা উচিত।

উরওয়াহ্'র এই কথাগুলো শুনে বনূ কিনানাহ্র একজন সম্ভ্রান্ত নেতা হুলাইস বিন আলকামাহ্ কুরাইশদের বলে, আপনারা অনুমতি দিলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যেতে চাই। তারা বলল, নিঃসন্দেহে যেতে পারো। অতঃপর সেই ব্যক্তি হুদায়বিয়ায় আসে আর মহানবী (সা.) তাকে দূর থেকে দেখেই সাহাবীদেরকে বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের দিকে আসছে সে এমন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে যারা কুরবানীর দৃশ্য পছন্দ করে। কাজেই তোমরা অতিসত্তর নিজেদের কুরবানীর পশুগুলোকে একত্র করে তার সামনে নিয়ে আসো যাতে সে বুঝতে পারে এবং অনুধাবন করে, আমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছি। অতএব সাহাবীরা যখন নিজেদের কুরবানীর পশুগুলোকে হাঁকিয়ে এবং আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করে তার সামনে সমবেত হয় তখন সে এই দৃশ্য দেখে বলে, সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্! এরা তো হাজী। বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করা থেকে এদেরকে কোনভাবে বিরত রাখা যেতে পারে না। অতঃপর সে দ্রুত কুরাইশদের কাছে ফিরে যায় এবং বলতে থাকে, আমি দেখেছি, মুসলমানেরা নিজেদের পশুগুলোর গলায় কুরবানীর মালা বেঁধে রেখেছে এবং সেগুলোর গায়ে কুরবানীর চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। অতএব, তাদেরকে কা'বা শরীফের তাওয়াফ থেকে বিরত রাখা কোনভাবে সমীচীন হবে না।

কুরাইশদের মাঝে তখন চরম বিভক্তি দেখা দিচ্ছিল এবং লোকেরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদল মুসলমানদেরকে যে কোন মূল্যে ফেরত পাঠাতে ও যুদ্ধ করার বিষয়ে ছিল বদ্ধপরিকর। কিন্তু অন্যদল এটিকে নিজেদের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল এবং একটি সম্মানজনক সমঝোতার আকাঙ্ক্ষী ছিল। এ কারণে সিদ্ধান্ত ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। তখন মিকরায বিন হাফ্স নামী এক আরব নেতা কুরাইশদের বলে, আমাকে যেতে দাও; আমি মীমাংসার কোন উপায় বের করবো। কুরাইশরা বললো, ঠিক আছে তুমিও চেষ্টা করে দেখ। অতঃপর সে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে। মহানবী (সা.) দূর থেকে তাকে দেখে বলেন, আল্লাহ্ মঙ্গল করুন, এই ব্যক্তি তো ভালো নয়। যাহোক, মিকরায তাঁর কাছে এসে আলোচনা আরম্ভ করে কিন্তু তার আলোচনা চলাকালেই মক্কার এক বিশিষ্ট নেতা সুহায়েল বিন আমর মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়- যাকে সম্ভবত কুরাইশরা ভীতবিহ্বল হয়ে মিকরাযের ফেরার অপেক্ষা না করেই পাঠিয়ে

দিয়েছিল। মহানবী (সা.) সুহায়েলকে আসতে দেখে বলেন, সুহায়েল আসছে। আল্লাহ্ চাইলে এখন বিষয় সহজ হয়ে যাবে।

যাহোক, এই সংলাপ চলতে থাকে। তখন এই ঘটনাও ঘটে যে, কুরাইশদের পক্ষ থেকে যখন একের পর এক দূত আসতে থাকে তখন মহানবী (সা.) অনুভব করেন, তাঁর পক্ষ থেকেও কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির কুরাইশদের কাছে যাওয়া উচিত, যে তাদেরকে সহমর্মিতা এবং বিচক্ষণতার সাথে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাতে পারবে। {মহানবী (সা.)} খিরাশ বিন উমাইয়াহ্ নামী এক ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করেন যে খুযা'আহ্ গোত্রের সদস্য ছিল। অর্থাৎ সেই গোত্র যার সাথে কুরাইশদের পক্ষ থেকে আগত সর্বপ্রথম দূত বুদায়েল বিন ওয়ারকার সম্পর্ক ছিল। এ উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.) খিরাশকে বাহন হিসাবে নিজের একটি উট প্রদান করেন। খিরাশ কুরাইশদের কাছে যায় কিন্তু যেহেতু তখনও আলোচনা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল আর কুরাইশ যুবকরা খুবই উত্তেজিত ছিল। এক উত্তেজিত যুবক ইকরামা বিন আবু জাহল খিরাশের উটের ওপর আক্রমনা করে সেটিকে আহত করে। আরবদের রীতি অনুসারে এর অর্থ ছিল, আমরা তোমাদের গতিবিধিকে বাহুবলে বাধা দিচ্ছি। শুধু তাই নয়, কুরাইশদের এই ক্ষেপাটে দল খিরাশের ওপরও আক্রমণ করতে উদ্যত ছিল কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণরা মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে তার প্রাণ রক্ষা করে আর তিনি ইসলামী শিবিরে ফিরে আসেন। (অর্থাৎ) কাফিরদের কাছ থেকে তিনি ফিরে আসেন। মক্কার কুরাইশরা এতেই ক্ষান্ত হয় নি বরং নিজেদের উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে এ বিষয়েরও সংকল্প করে যে, এখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা মক্কার এতটা নিকটে এবং মদীনার এত দূরে এসেছেন তাই তাদের ওপর আক্রমণ করে যথাসম্ভব ক্ষতি সাধন করা যায়। অতএব তারা এ উদ্দেশ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল হুদায়বিয়া অভিমুখে প্রেরণ করে আর তখন উভয় পক্ষের মাঝে যে সংলাপ চলছিল এর ছদ্মাবরণে তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করে যে, ইসলামী শিবিরের আশেপাশে প্রদক্ষিণ কর, ওঁৎ পেতে থাক আর সুযোগ বুঝে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করতে থাক। বরং কোন কোন বর্ণনা থেকে এটিও জানা যায়, তারা সংখ্যায় ছিল আশিজন আর এই সুযোগে কুরাইশরা মহানবী (সা.)-কে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু যাহোক, মুসলমানরা আল্লাহর কৃপায় নিজেদের জায়গায় সাবধান ও সচেতন ছিলেন। কাজেই, কুরাইশদের এই ষড়যন্ত্রের গোমর ফাঁস হয়ে যায় আর এদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়। মক্কাবাসীর এমন আচরণে, যা পবিত্র মাসগুলোতে বলতে গেলে হারাম শরীফের ভেতর করা হয়েছিল, মুসলমনরা খুবই ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত ছিল কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং শান্তি-সংলাপে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দেন নি। মক্কাবাসীর এহেন আচরণের কথা পবিত্র কুরআনও উল্লেখ করেছে। আল্লাহ তা'লা বলেন, هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا অর্থাৎ, মক্কার উপত্যকায় আল্লাহ্ নিজ কৃপায় কাফিরদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন এবং তোমাদের সুরক্ষা করেছেন আর তোমরা যখন তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছ এবং তাদেরকে নিজেদের করতলগত করেছ তখন তিনি তাদের থেকে তোমাদের হাতকে বিরত রেখেছেন। (সূরা আল্ ফাতাহ্: ২৫)

যাহোক, যখন আমরা এই সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সেই প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর ক্রমাগত ধৈর্য, স্থৈর্য ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তখন আমরা দেখতে পাই, তা ধৈর্য ও শান্তি স্থাপনের এমন এক পরম প্রচেষ্টা, যার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি (সা.) ক্রমাগত এই চেষ্টায়

ব্যাপৃত ছিলেন যেন শান্তির কোন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মহানবী (সা.) যখন কুরাইশদের দুষ্কৃতি দেখেন এবং একইসাথে খিরাশ বিন উমাইয়াহ্‌র সাথে মক্কাবাসীদের উত্তেজিত আচরণের কথা শোনেন, তখন কুরাইশদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করতে চান, যিনি মক্কারই বাসিন্দা এবং কুরাইশদের কোন সম্ভ্রান্ত গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখবেন। অর্থাৎ, এতকিছুর পরও তিনি (সা.) চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নি, বরং এত কিছুর পরও অন্য কাউকে পাঠানোর এই ঝুঁকি নেন। অতএব তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে বলেন, ভালো হয় যদি আপনি মক্কায় যান এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি জানেন. মক্কার লোকেরা আমার প্রতি তীব্র শত্রুতা রাখে এবং বর্তমানে মক্কায় আমার গোত্রের এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি নেই, মক্কাবাসীদের ওপর যার প্রভাব থাকতে পারে। এজন্য আমার পরামর্শ হল, সাফল্যের পথ সুগম করার লক্ষ্যে এই সেবার জন্য উসমান বিন আফফান (রা.)-কে বেছে নেয়া হোক, যার গোত্র বনু উমাইয়াহ্‌ বর্তমানে অত্যন্ত প্রভাবশালী; আর মক্কাবাসীরা উসমান (রা.)'র বিরুদ্ধে দুষ্কৃতির দুঃসাহস দেখাতে পারবে না এবং হযরত উসমান (রা.)-কে পাঠালে সাফল্যের সমূহ্‌ সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরামর্শ মহানবী (সা.) পছন্দ করেন এবং তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে মক্কায় যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং কুরাইশদেরকে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় ও উমরা পালনের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত করেন। আর তিনি (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে নিজের পক্ষ থেকে কুরাইশ-নেতাদের নামে একটি চিঠিও লিখে দেন। এই চিঠিতে মহানবী (সা.) নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং কুরাইশদের নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল একটি ইবাদত পালন করা আর আমরা শান্তিপূর্ণভাবে উমরা পালন করে ফিরে যাব।

তিনি (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে এটিও বলেন, মক্কায় যেসব দুর্বল মুসলমান রয়েছে তাদের সাথেও সাক্ষাতের চেষ্টা করবে এবং তাদের সাহস ও মনোবল দৃঢ় করবে আর তাদেরকে বলবে, তোমরা আরেকটু ধৈর্য ধারণ কর, অচিরেই খোদা তা'লা সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করবেন। এ বার্তা নিয়ে হযরত উসমান (রা.) মক্কায় যান এবং আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করেন যিনি সে যুগে মক্কার (একজন) সম্ভ্রান্ত নেতা ছিলেন এবং হযরত উসমান (রা.)'র নিকটাত্মীয়ও ছিলেন। {হযরত উসমান (রা.)} মক্কাবাসীদের এক জনসভায় উপস্থিত হন। সেই সভায় হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর লিখিত পত্র উপস্থাপন করেন যা একে একে কুরাইশদের বিভিন্ন নেতাও দেখে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সবাই এ হঠকারিতায় অনড় ছিল যে, মুসলমানগণ এ বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত উসমান (রা.)'র জোর দেয়ার পর কুরাইশরা বলে, তোমার যদি বেশি আগ্রহ থাকে তবে আমরা তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে বায়তুল্লাহ্‌ তওয়াফ করার সুযোগ দিচ্ছি, কিন্তু এর অধিক নয়। হযরত উসমান (রা.) বলেন, এটি কীভাবে হতে পারে যে, মহানবী (সা.)-কে মক্কার উপকণ্ঠে আটকে রাখা হবে আর আমি তওয়াফ করব? কিন্তু কুরাইশরা কিছুতেই মানল না। অবশেষে হযরত উসমান (রা.) হতাশ হয়ে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তখন মক্কার দুষ্কৃতকারীদের মাথায় যে দুষ্টবুদ্ধি ভর করে তা হল, তারা হযরত উসমান (রা.) এবং তার সাথীদের মক্কায় আটকে রাখে সম্ভবত এ ভেবে যে, এভাবে আমরা সমঝোতায় অধিক লাভজনক শর্তাবলী মানাতে পারব। তখন মুসলমানদের মাঝে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কাবাসীরা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। এ সংবাদ

পৌঁছার পর মহানবী (সা.)ও গভীরভাবে শোকাহত ও ক্রুদ্ধ হন। তখন তিনি সেখানে বয়আতে রিযওয়ান গ্রহণ করেন।

এ সম্পর্কে লেখা আছে, এ সংবাদ হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর মুসলমানদের মাঝে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কেননা উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর জামাতা এবং সবচেয়ে সম্মানিত সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। মক্কায় তিনি ইসলামী দূত হিসাবে গিয়েছিলেন। আর সেই দিনগুলোও **'আশহারে হুরুম'** অর্থাৎ সম্মাজনক বা পবিত্র মাস-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মক্কা স্বয়ং হারাম বা পবিত্র এলাকা ছিল। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ সমস্ত মুসলমানের মাঝে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে একটি বাবলা গাছের নিচে সমবেত করেন। অতঃপর সাহাবীরা যখন একত্রিত হয় তখন এই সংবাদের কথা উল্লেখ করে তিনি (সা.) বলেন, যদি এই সংবাদ সঠিক হয়ে থাকে তবে খোদার কসম! আমরা এই জায়গা হতে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বো না যতক্ষণ পর্যন্ত উসমানের (হত্যার) প্রতিশোধ না নেই। অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, 'আসো এবং আমার হাতে হাত রেখে (অর্থাৎ ইসলামের বয়'আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত আছে তদনুযায়ী) এই অঙ্গীকার কর, তোমাদের কেউ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না এবং নিজ জীবন বাজি রেখে লড়াই করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিজ স্থান ত্যাগ করবে না। এই ঘোষণা শুনে সাহাবীগণ বয়'আতের জন্য এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, একে-অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন। এই ১৪০০-১৫০০ মুসলমানের প্রত্যেকেই নিজ প্রিয় মনিবের হাতে পুনরায় বয়'আত করে বিক্রি হয়ে যায়; সে সময় ইসলামের সামগ্রিক পুঁজি এটিই ছিল; অর্থাৎ এটিই মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিল। যখন বয়'আত নেয়া হচ্ছিল, তখন তিনি (সা.) তাঁর বাম হাত তাঁর ডান হাতের ওপরে রেখে বলেন, এটি উসমানের হাত। কেননা যদি সে এখানে উপস্থিত থাকতো তবে এই পবিত্র বাণিজ্যে কারো চেয়ে পিছিয়ে থাকতো না। কিন্তু এখন সে খোদা ও তাঁর রসূলের কাজে নিয়োজিত। এভাবেই বিদ্যুত সদৃশ এই দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটে।

ইসলামের ইতিহাসে এই বয়'আত **'বয়'আতে রিযওয়ান'** নামে সু-পরিচিত। অর্থাৎ সেই বয়'আত যেখানে মুসলমানগণ খোদা তা'লার পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনের পুরস্কার লাভ করেছেন। পবিত্র কুরআনও বিশেষভাবে এই বয়'আতের কথা উল্লেখ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন, لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا অর্থাৎ, হে রসূল! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়'আত করছিল। কেননা এই বয়'আতের মাধ্যমে তাদের অন্তরের সুপ্ত নিষ্ঠা আল্লাহ তা'লার প্রকাশ্য জ্ঞানে এসে গেছে। অতএব, খোদাও তাদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন আর তাদের তিনি এক নিকটবর্তী বিজয়ে ধন্য করেন। **(সূরা আল্ ফাতাহ্: ১৯)**

সাহাবীগণ (রা.)ও এই বয়'আতের কথা সর্বদা অত্যন্ত গর্ব ও ভালোবাসার সাথে বর্ণনা করতেন এবং তাদের অধিকাংশরাই পরবর্তী যুগের লোকদের বলতেন, **তোমরা তো মক্কা বিজয়কে বিজয় মনে কর, কিন্তু আমরা বয়'আতে রিযওয়ানকেই প্রকৃত বিজয় মনে করতাম।** এতে কোন সন্দেহ নেই, এই বয়'আতের অনুসঙ্গ সমূহ ও শর্তের আলোকে এটি একটি অতি মহান বিজয় ছিল। শুধু এজন্য নয় যে, এটি ভবিষ্যতের অন্যান্য বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করেছে, বরং এজন্যেও যে, এর মাধ্যমে অতি মহান রূপে ইসলামের সেই প্রাণ বিকিয়ে দেয়ার চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যা কিনা মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু আর ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা নিজেদের কর্মদ্বারা

প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা তাদের রসূল এবং এই রসূল (সা.)-এর আনীত সত্যের খাতিরে প্রতিটি ক্ষেত্রে আর সেই (রণ)ক্ষেত্রের প্রত্যেক পদক্ষেপে জীবন ও মৃত্যুকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বয়'আতে রিযওয়ানের কথা উল্লেখ করে বলতেন, **এই বয়'আত ছিল মৃত্যুকে বরণ করার (স্বীকৃতিস্বরূপ) বয়'আত**। অর্থাৎ এই প্রতিজ্ঞায় বয়'আত করেছিল যে, প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের খাতিরে এবং ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে নিজেদের জীবন বাজি রাখবে তথাপি পিছু হটবে না। আর এই বয়'আতের বিশেষ দিকটি হল, এই অঙ্গীকার ও শপথ কেবল বুলিসর্বস্ব কোন সাময়িক স্বীকৃতি ছিল না, যা কোন সাময়িক উত্তেজনার বশে করা হয়ে থাকবে, বরং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উদ্ভূত ধ্বনি ছিল যার পেছনে মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তি এক বিন্দুতে পুঞ্জীভুত ছিল।

কুরাইশরা এই বয়'আত সম্বন্ধে জানতে পেরে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা শুধু হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদেরই মুক্ত করে দেয় নি, বরং তাদের দূতদেরও এ নির্দেশনা প্রদান করে যে, এখন যেভাবেই হোক, মুসলমানদের সাথে চুক্তি করুন, কিন্তু এ শর্ত অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে, মুসলমানরা যেন এ বছরের পরিবর্তে আগামী বছর এসে উমরা করে আর এখন যেন ফিরে যায়। অপরদিকে মহানবী (সা.)ও শুরু থেকেই এই অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন, এ অবস্থায় আমি এমন কোন কথা বলবো না, যা মহর্‌রম মাসের পবিত্রতা এবং কা'বা গৃহের সম্মান পরিপন্থী হবে আর আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু তাঁকে এই সুসংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন যে, এ অবস্থায় কুরাইশদের সাথে শান্তিচুক্তি ভবিষ্যৎ সফলতার পথ সুগম করবে, তাই উভয় পক্ষের জন্য এই পরিবেশ যেন সন্ধি ও মীমাংসার এক অতি উত্তম পরিবেশ ছিল আর এ পরিবেশেই সোহেল বিন আমর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়। আর মহানবী (সা.) তাকে দেখেই বলেন, এখন মনে হচ্ছে বিষয়টি সহজ হবে। সন্ধির আলোচনা শুরু হলে সোহেল বিন আমর যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট আসে তখন তিনি (সা.) তাকে দেখেই বলেন, (যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে,) সোহেল আসছে, আল্লাহ্ চাইলে এখন বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে। যাহোক, সোহেল এসেই মহানবী (সা.)-কে বলে, চলুন! এখন দীর্ঘ বিতর্ক বাদ দিন, আমরা চুক্তি করতে প্রস্তুত আছি। প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, আমরাও প্রস্তুত আছি। একথা বলেই তিনি (সা.) তাঁর সেক্রেটারী হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে পাঠান। এই চুক্তির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:-

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এ বছর ফিরে যাবেন। আগামী বছর তারা মক্কায় এসে উমরার আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে, কিন্তু শর্ত হল, সাথে খাপবদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং মক্কায় তিন দিনের বেশি অবস্থান করবে না।

মক্কার লোকদের মধ্যে থেকে কেউ যদি মদীনায় যায় তাহলে সে মুসলমান হলেও মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় আশ্রয় দিবেন না এবং তাকে ফেরৎ পাঠাবেন। কিন্তু কোন মুসলমান যদি মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে না। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, মক্কার কেউ যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মদীনায় যায় তাহলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

আরব গোত্রগুলোর মধ্যে থেকে কোন গোত্র চাইলে মুসলমানদের সাথেও মৈত্রী গড়তে পারে কিংবা মক্কাবাসীর মিত্রও হতে পারবে।

এই চুক্তি আপাতত দশ বছরের জন্য হবে আর এই সময়কালে কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

এই চুক্তির দু'টি অনুলিপি করা হয় আর দু'পক্ষের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের মাঝে যারা স্বাক্ষর করেন তারা হলেন, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), (ততক্ষণে তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসেছিলেন। অর্থাৎ কাফিররা যে তাকে আটকে রেখেছিল সেখান থেকে ততক্ষণে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। তিনিও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।) আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং আবু উবায়দাহ্ (রা.)। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সোহেল বিন আমর চুক্তিপত্রের একটি প্রতিলিপি নিয়ে মক্কা অভিমুখে ফিরে যায় এবং দ্বিতীয় প্রতিলিপিটি থাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃঃ ৭৪৯-৭৬৯}**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনাটি নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আশেপাশের কিছু লোক মক্কাবাসীদের কাছে জোর দিয়ে বলে, এই লোকেরা শুধু তওয়াফ করার জন্য এসেছেন, আপনারা তাদেরকে কেন বাধা দিচ্ছেন? কিন্তু মক্কাবাসীরা তাদের হঠকারিতায় অনড় থাকে। তখন বাহিরের গোত্রগুলোর লোকেরা মক্কাবাসীকে বলে, আপনাদের এ পন্থা বলে দিচ্ছে যে, আপনাদের উদ্দেশ্য সন্ধি নয় বরং দুষ্কৃতি। এজন্য আমরা আপনাদের পক্ষ নিতে প্রস্তুত নই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে কথাটি বলেছেন তা একটি নতুন কথা। অর্থাৎ আশপাশের গোত্রগুলোর পক্ষ থেকেও চাপ ছিল যার ফলে মক্কাবাসীরা ভয় পেয়ে যায় আর তারা এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে যে, মুসলমানদের সাথে আমরা সমঝোতা করার চেষ্টা করব। এ বিষয়ের সংবাদ পেতেই মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে, মক্কাবাসীর সাথে আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন যিনি পরবর্তীতে তাঁর তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন । হযরত উসমান (রা.) যখন মক্কায় পৌঁছান তখন মক্কায় যেহেতু তার অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল, তার আত্মীয়রা তার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয় এবং তাকে বলে, আপনি তওয়াফ করতে পারেন তবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আগামী বছর এসে তওয়াফ করবেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি আমার সম্মানিত নেতাকে ছাড়া তওয়াফ করতে পারব না। যেহেতু মক্কার সর্দারদের সাথে তার আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, তাই কিছু সংখ্যক দুষ্ট প্রকৃতির লোক মক্কায় এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের একত্র করেন এবং বলেন, প্রত্যেক জাতির নিকটই দূতের জীবন নিরাপদ থাকে। তোমরা শুনে থাকবে, মক্কাবাসীরা উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। এই সংবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করব। অর্থাৎ আমাদের প্রাথমিক ইচ্ছা ছিল, শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করার, কিন্তু যে পরিস্থিতিতে সেই ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছিল সেই পরিস্থিতি যেহেতু বদলে গেছে তাই আমরা এই পরিকল্পনার অনুসরণে বাধ্য থাকব না। যারা এই অঙ্গীকার করতে প্রস্তুত যে, যদি আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয় তাহলে হয় (মক্কা) জয় করে ফিরব নয়তো একেক করে সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করব, তারা এই শপথ করে আমার হাতে বয়'আত করুক। মহানবী (সা.) এ ঘোষণা দিতেই তাঁর সাথে আগত সেই পনেরশ' দর্শনার্থীর সবাই এক মুহূর্তেই পনেরশ' সৈনিকে রূপান্তারত হন এবং উন্মাদপ্রায় হয়ে পরস্পরকে টপকে গিয়ে তারা একজন আরেকজনের পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে বয়'আত করার চেষ্টা করেন। পুরো ইসলামী ইতিহাসেই এ বয়'আত অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে আর একে বৃক্ষের চুক্তি বলা হয়। কেননা এই বয়'আত গ্রহণ করার সময় মহানবী (সা.) একটি গাছের নিচে বসেছিলেন।

এই বয়'আতে অংশ গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তিও যতদিন পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি গর্বের সাথে একথাটি স্মরণ করতেন। কেননা পনেরশ' মানুষের মধ্যে একজনও এই অঙ্গীকার করতে দ্বিধা করেন নি। শত্রুরা যদি ইসলামের দূতকে হত্যা করে থাকে তাহলে আজ আমরা দু'টি অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি করব। অর্থাৎ হয় তারা সন্ধ্যার পূর্বেই মক্কা বিজয় করবে নয়তো তারা সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিবে। কিন্তু মুসলমানরা তখন সবেমাত্র বয়'আত করে শেষ করেছিল, এমন সময় হযরত উসমান (রা.) ফিরে এসে বলেন, মক্কাবাসীরা তো এ বছর উমরা করার অনুমতি দিতে পারবে না, কিন্তু আগামী বছরের জন্য অনুমতি দিতে প্রস্তুত। কাজেই এ বিষয়ে চুক্তি করার জন্য তারা তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে। হযরত উসমান (রা.)'র আগমনের কিছুক্ষণ পরই সন্ধির উদ্দেশ্যে সোহেল নামী মক্কার এক নেতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং এই চুক্তিপত্র লিখা হয়। **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ৩০৭-৩০৮)**

হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। বাকী আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। পাকিস্তানের পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। এখন বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যেও (তারা) নিরাপদ নয়, নিজ গণ্ডিতেও নিরাপদ নয়। মৌলভীরা যেখানেই বলে, পুলিশের লোক সেখানেই পৌঁছে যায়। এমন কিছু ভদ্র পুলিশও আছে যারা বলে, আমাদের সহানুভূতি আপনাদের সাথে রয়েছে, কিন্তু আমরা কী আর করতে পারি! কেননা আমাদের ওপর এতটা চাপ প্রয়োগ করা হয় যে, আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যা বলে তা-ই আমাদের করতে হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এসব দুষ্ট প্রকৃতির কর্মকর্তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন, দেশকে নিষ্কৃতি দিন আর প্রত্যেক আহমদীকে স্বাধীনভাবে এবং নিরাপত্তার সাথে নিজ মাতৃভূমিতে বসবাসের তৌফিক দিন। বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকুন। এ দোয়া যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহু তা'লা খুব শীঘ্রই আমরা দেখব, বিরুদ্ধবাদীদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক হবে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দোয়া করারও তৌফিক দিন আর তা কবুলও করুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, পৃঃ ৫-১১)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)